ভাওয়াইয়া সংগীতে গাড়িয়াল, মাহুত ও মইষ্যাল-এর ভূমিকা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

বঙ্গীয় সংস্কৃতির প্রাণ হ'ল সংগীত। সেই আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাগীতি*। এই গীতিপ্রাণতাই বাংলা কবিতা সাহিত্যের অন্তর দৃষ্টান্ত। মধুসূদন দত্তের সনেটে যে গীতিময়তার শুরু বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের মুখ্য পরিচয় তিনি একজন গীতি কবি। ব্যক্তি প্রয়াসে রচিত সংগীতের কথা আলোচনার মধ্য দিয়েই বাংলার লোকসংগীত বিষয়ে আলোচনার যোগ সূত্র তৈরি হয়ে যায়।

লোকসংগীত রচনার সময়কাল বা স্রষ্টা সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা যায়না, কারণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বিশেষ কোনও সংগীত রচিত হলেও তিনি সেই সংগীত রচনা করেন সংহত সমাজের মুখপাত্র রূপে। তাঁর রচিত সংগীতে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ানুভূতিটুকু বিবৃত হয় না, সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতাটুকু প্রতিফলিত হয়।

বাংলা লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধতম বিভাগ লোকসংগীতের জনপ্রিয়তার কারণ এর ভাষার চেয়ে সুরের প্রাধান্য বেশি। এই সুরের মাদকতা সহজেই শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে। লোকসংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ে টুসু, ভাদু, জারি, ভাওয়াইয়া, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদি প্রতিটি গানের জন্যই বিশেষ বিশেষ সুর নির্দিষ্ট। এইসব আঞ্চলিক সংগীতগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া সংগীতের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র, সুর, বিষয় এগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয় হতে পারে।

'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ নিয়ে নানা সমালোচক নানা কথা বলেন। 'ভাব' শব্দটি থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ভাব + ইয়া প্রত্যয় যোগে ভাবিয়া, তার থেকে ভাওয়াইয়া। অর্থাৎ, যে গানের সুর এবং বিষয়বস্তু অন্তরকে দোলা দেয়, ভাবিয়ে তোলে। অনেকের মতে, কোচবিহার, দিনাজপুর, রঙ্গপুর অঞ্চলের বাউদিয়া সম্প্রদায়ের নাম অনুযায়ীই শব্দটির উৎপত্তি। বাউদিয়া হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় শ্রেণির মানুষ নিয়ে গঠিত এক যাযাবর সম্প্রদায় আর এই সম্প্রদায়েরই গান হল ভাওয়াইয়া। উত্তরবঙ্গে এই গান জনপ্রিয়তার বিচারে অন্য সব গানের শীর্ষে। গল্পের মধ্যে যেমন ট্রাজিক রসই শ্রেষ্ঠ, তেমনি সংগীতের ক্ষেত্রেও বিষাদান্ত সংগীতের আকর্ষণ পাঠক চিত্তে প্রবল বলেই প্রতিভাত। কেবল সংগীত কেন সাহিত্যেও বিষাদাত্মক পরিণতিতে লেখক বলেন – 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' বাংলার সীমিত সংখ্যক বিষাদান্ত লোকসংগীতের মধ্যে 'ভাওয়াইয়া' অন্যতম।

উত্তরবঙ্গ আর তার সন্নিহিত অঞ্চলের বিশ্ব-নন্দিত 'ভাওয়াইয়া' লোকসংগীত সামগ্রিক ভাবে কাল

অতিক্রম করেছে। উত্তরের এ অঞ্চল দেখেছে বহু উত্থান-পতন। মুসলিম বা বৃটিশ রাজশক্তির শাসনকাল, প্রতিবেশী ভুটান রাজ্যের বারবার আক্রমণ, বা কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরের রাজদরবারের শিষ্ট আর্যসংস্কৃতির অনুসরণ উত্তরবঙ্গের জনজীবনের অকৃত্রিম কৃষিভিত্তিক সমাজকে বিচলিত করেনি। ফলে এখানকার রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ভাষা প্রায় অবিকৃতই থেকেছে।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, অসমের গোয়ালপাড়া, উত্তর দিনাজপুরের উত্তরাংশ, কিছুটা তার সংলগ্ন বিহারের অংশ এবং রংপুরের উত্তরদিক জুড়ে কোচ-রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাস। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোক সংস্কৃতির ধারক-বাহক রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ। সংগীতময় জীবন এদের। প্রেম-প্রীতি, বিরহ, বিবাহ, মৃত্যু, সেই সুরের আলোকে উদ্ভাসিত। সংস্কৃতির মূল সুর (Tune) 'ভাওয়াইয়া'। এই ভাওয়াইয়া সুরের বিস্তার বিভিন্ন জেলা, রাজ্য, ভিন রাষ্ট্রেও। গোয়ালপাড়া (আসামের ধুবড়ি জেলা) রংপুর (বাংলাদেশ) তো উত্তরাধিকার সূত্রে একই সংস্কৃতির সমান দাবিদার। একই ভাষা, একই অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মও অভিন্ন, মানসিকতা সমভাবাপন্ন। সব মিলিয়ে প্রশাসনিক সীমা রেখার দিকে না গিয়ে এই বিশেষ সংস্কৃতি ক্ষেত্রটিকে 'ভাওয়াইয়া অঞ্চল' বলা যুক্তিযুক্ত।

উত্তরবঙ্গের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে তিনটি নতুন দিক, আলাদা তিন-পেশা লক্ষ্য করা যায়। কৃষিজাত পণ্য বা গোলদারী সামগ্রী উজানে ভাটিতে দেওয়া নেওয়া হ'ত গোরুর গাড়িতে। চালকের পরিচয় – গাড়িয়াল। উত্তরবঙ্গের দিগন্ত বিস্তৃত পতিত জমি, নিবিড় জঙ্গল মানুষকে পশু-পালনে উৎসাহিত করেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মহিষ পালন, আর মহিষের দেখা শোনা করছে যে সেই 'মইষ্যাল'। পাহাড়ী গা বেয়ে বনাঞ্চল। প্রকৃতির আশীর্বাদের মত ছড়িয়ে আছে। বিশেষতঃ ডুয়ার্সে ও গোয়ালপাড়ায় বুনোহাতি ধরা শুরু হয়েছিল ফাঁদ পেতে। এই বন্য হাতি ধরতেই 'ফান্দি'। এই ভাষা টেকনিক্যাল। ফান্দির সাধারণ অর্থ 'মাহুত'। গাড়িয়াল, মৈষাল ও মাহুত জীবিকার এই তিন পর্যায় নিয়ে গড়ে উঠলো তিন পৃথক সংস্কৃতি সংস্কার, রুচি, শব্দভাণ্ডার যা তাদের পেশার সঙ্গে কেবল যুক্তই নয়, ব্যবহারিক জীবনেও তার ছায়া পড়েছিল। মানুষ সমাজের একক, সমাজ-দর্পণে তার ছায়া বা প্রতিবিম্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক।

গাড়িয়াল, মাহুত, মইষ্যাল এই তিন চরিত্র আনুমানিক পঞ্চাশবছর আগেও অস্তিত্ব ছিল। চাষির জীবন ছিল ষড় ঋতুচক্রে বাঁধা। আষাঢ় শ্রাবণে রোয়া গাড়া। পৌষে ফসল তোলা। এই উত্তরবঙ্গের সামাজিক জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক শোভা, নদ-নদী, ঋতুপর্যায় প্রভৃতি উপাদান ভাওয়াইয়া সংগীতে বিশেষভাবে জায়গা নিয়েছে। বিচ্ছেন কাতরা বিরহিনী নারীর নায়ক কোথাও বন্ধু, কোথাও গাড়িয়াল ভাই, কোথাও বা মৈষাল বন্ধু ও মাহুতবন্ধু। কোনও দূর প্রবাস যাত্রী-বন্ধুর উদ্দেশ্যে প্রেম-পাগলিনী নারীর গান–

কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে,
কোন্ দিন আসিবেন বন্ধু
কয়্যা যাও, কয়্যা যাওরে ---

কর্মব্যস্ত প্রেমিক দূরদেশ থেকে কবে ফিরবে জানা নেই। এই দীর্ঘ ব্যবধান কি করে সইবে হতভাগিনী নারী? তাই প্রিয়তমের স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে শান্তি পেতে চায় –

যদি বন্ধু যাবার চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাওরে,
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে –
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে
কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে।

গাড়িয়ালের জীবন চলমান। কখনও উজানে কখনো বা ভাটিতে। নানা গাঁ-গঞ্জ, হাট-বন্দর, জনপদ ঘুরে আসতে সদা ব্যস্ত। গ্রামের মানুষের কাছে এই আকর্ষণীয় চরিত্র গাড়িয়াল কে নিয়ে গ্রাম্য কন্যার প্রেম-বিরহ প্রসঙ্গে অনেক রোমান্টিক কাহিনিও জড়িয়ে আছে।

'– ও কি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে
ও কি গাড়িয়াল ভাই
কত কান্দিম মুই নিধুয়া পাথারে রে।'

'ভাওয়াইয়া' গানে পরকীয়া প্রেমের কথাও আছে' বৈষ্ণব দার্শনিক ও বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র প্রণেতারা পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব সবসময়ই মেনে নিয়েছেন।

বিরহপীড়িতা এক নারী-হৃদয়ের করুণ আর্তি নিচের গানটিতে প্রকাশিত –

ও (আহারে) জানিয়াও জানেন না
শুনিয়াও শুনেন না।
আই মোর জ্বালেয়া গেলেন মনের আগুন
নিভিয়া গেইলেন না।
ও তোর নয়নে কাজল
তিলেক দণ্ড না দেখিলে
মন হয় রে পাগল।

উদ্ধৃত গানটির শেষ কয়েকটি পংক্তির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর মিল আছে। 'দুঁহু কোরে, দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া / আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া'।

ভাওয়াইয়া নারী মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, বিচ্ছেদ, মিলন, আর্তির সংগীত। পুরুষই রচনা করে – সুরেলা কণ্ঠে ভাবকে প্রকাশ করে। এই গাড়িয়াল বা 'বাঁকিয়া' গানের মতই আর একটি প্রিয় গীতিধারা 'মইষাল' গান।

কোচবিহার, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে হাতি এবং হাতির মাহুত কে কেন্দ্র করে ভাওয়াইয়া সুরে গাওয়া এই গান। 'মাহুত বন্ধুর গান' নামেও এর পরিচিতি আছে। জলপাইগুড়িতে 'মইষাল' বন্ধুর গান নামেই প্রচলিত। উভয় প্রকার গানেই বিষয়বস্তু মূলত এক। প্রকাশ ভঙ্গিতেও সাদৃশ্য আছে। 'মইষাল বন্ধু' এবং 'মাহুত বন্ধুর' গানের নামকরণ মাহুতের জীবনকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। নদীর চরে বা জঙ্গলে যারা মোষ চরায় তাদের বলে 'মইষাল'। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতে তাদের মোষ নিয়ে যেতে হয় দূরবর্তী নদীপ্রান্তরে বা জঙ্গলে। মোষের বাতানে বা বাথানে তাদের থাকতে হয়। 'মইষের পাল' বিশেষ একটি স্থানে রাখার ব্যবস্থা হয়। ঐ জায়গাটি কে 'মইষের বাতান' বা 'বাথান' বলে। এই জীবন অত্যন্ত কষ্টের। মশা, মাছি, হিংস্র বন্যজন্তু এসবের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে থাকতে হয়। দুঃসহ কষ্ট প্রতিপদে। তবু জীবিকার তাগিদে মইষ্যাল বা মোষ নিয়ে চলে যায় প্রিয়জনদের ছেড়ে। বাথানেই পাওয়া যেত দুধ থেকে উৎপন্ন 'পয়োধি'। কাঁচা দুধ থেকে মাখন বের করে সেই দুধ 'দাগরা-দই' তৈরিতে ব্যবহার হত। এ দই স্বাদে 'টক'। বা অম্ল জাতীয়। পরে এ থেকে ছাঁচি দই তৈরি হত। সপ্তাহান্তে 'গিরী' এলে হিসেব নিকেশ মৈষাল বুঝিয়ে দিত। মইষালের জীবন ও বাথানকে কেন্দ্র করে বিরহিনী প্রিয়া গেয়ে ওঠেন গান –

'মইষ চরাণ মইষ্যাল বন্ধুরে
বন্ধু কোন্ বা চরের মাঝে
এলা ক্যানে ঘন্টির বাজন
না শোনং মুই কানে, মইষ্যাল রে।'

মইষালের নিদারুণ দুঃখ কষ্টের চেয়েও বিরহপীড়িতা নারী হৃদয়ের আর্তি অতি তীব্র –

'ছোট কালে হইচে বিয়া রে মইষাল
বয়স ভাটি গেলো
না হইলং ছাওয়ার মাও
মনে রইলেক দুঃখ মইষাল রে ----।'

'মইষাল বন্ধু'র গানেও পরকীয়া তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। 'বাথানে' বাস কালে অন্য রমনী আসক্ত মইষ্যাল। কিন্তু স্থান পরিবর্তন সময়ে দূরে যেতে হচ্ছে। প্রেম পাগলিনী কণ্ঠে ধ্বনিত হয় –

'আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংরা মইষাল রে
মইষের পিটিং চড়িয়া মইষাল
ছিড়েন কাশিয়ার ফুল।
আষাঢ়ো শ্রাবণ মাসে নদী হুলাস্থুলা রে
আজি ছাড়িয়া না যান চ্যাংরা মইষাল রে।

ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে আসাম প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যে ভরপুর। এখানকার গভীর জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, বনজ-সম্পদ অনেককে আকর্ষণ করে। আসামের গভীর জঙ্গলে খোলা আকাশের নীচে দল বেঁধে বাস করে হাতি। হাতি ভয়ঙ্কর হলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানব সমাজের নিরন্তর সংগ্রামে মানুষ বিজয়ী। তাই হাতিও তার কাছে পরাজয় মেনে নেয়। এই বন্য হস্তীকে ধরে ফাঁদ পেতে তাই এরা 'ফান্দী'। দিনের পর দিন গভীর জঙ্গলে এরা হাতি ধরার চেষ্টা করে। নিয়মিত স্নান আহারও জোটেনা। নিরাপত্তাও কিছু নেই। এদের মত মাহুত জীবনও কষ্টের। এই জীবনকে কেন্দ্র করেই মাহুত-গানের সৃষ্টি বহু দিন আগেই। মাহুত, ফান্দীকে অবলম্বন করে নারী হৃদয়ের যে ভয়, উৎকণ্ঠা, বিরহ-বিচ্ছেদ, বিলাপ-আর্তনাদ এসবই গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। বিরহকাতরা নারীর বুক ফাটা আর্তনাদ যেন আকাশে বাতাসে প্রতিফলিত।

গোয়াল পাড়িয়া সেই বিখ্যাত গান অনুরণন তোলে আজও।

'তোমরা গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধুরে ----'

সাধারণতঃ যে বিপত্নীক এবং মাতৃহীন সেই হাতি ধরা অর্থাৎ ফান্দীর কাজ করার যোগ্য মনে করা হ'ত। হাতি শিকারে যাবার জন্য কী কী সাজ সরঞ্জাম নিয়ে থাকে সে সম্পর্কে গানেও আছে –

'ফান্দং নিলুং, ফাড়ারে নিলুং
আরো নিলুং হাড়ি
মাহুত ফান্দী যুক্তি করিয়া
চলিলং শিকার বাড়ি।'

যখন ফান্দী বা মাহুতরা দীর্ঘকালের জন্য শিকারে যায় তখন পত্নীরা মনের দুঃখে গেয়ে ওঠে –

ও কি দান্তাল হাতির মাহুত রে –
আরে যে দিন মাহুত শিকারে যায়
নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয়রে।
ও মোর দান্তাল হাতির মাহুত রে –
যেদিন মাহুত ছাড়িয়া যায়
নারীর মন মোর পড়িয়া রয়রে –

কোথাও কোথাও মাহুত এবং ফান্দীর কণ্ঠেও প্রিয়ার সান্নিধ্য পাওয়ার তীব্র আকুলতা –

'মাওক ছাড়িলুং বাপক ছাড়িলুং
ছাড়িলুং বাপের বাড়ি
গোয়াল পাড়াৎ ছাড়িয়া আইলুং
অল্প বয়সের নারী।'

মাহুত বন্ধুর গানের মধ্যে মাহুত ও ফান্দীর জীবন ও জীবিকার সুখ শান্তি সমৃদ্ধির চেয়ে দুঃখ ও বিরহ যন্ত্রণা বেশিই প্রকাশিত। তাদের জীবনের গভীর দুঃখ এবং ট্রাজেডি হল তারা পারিবারিক সুখ শান্তি থেকে চির বঞ্চিত।

ভাওয়াইয়া গানের একমাত্র এবং অপরিহার্য সংগত যন্ত্র দোতারা বা দোতরা। এর চারটি তার আছে। প্রথম মোটা তারের নাম 'বোম'। শেষের সরু তারটি 'জীন' এবং মাঝখানে অবস্থিত দুটি তারকে 'সুর' বলে। চারটি তার সমন্বিত অথচ নাম দোতরা এর কারণ অজানা। দোতরার আকৃতিটিও যেন 'বাথানা' সংস্কৃতির দান। আওয়াজ মন্দ্র। 'ডাং' অর্থাৎ 'stroke'। দোতরা বাজাবার বিশেষ style চুটকীর (শিং বা কাঠের টুকরো) উঁচু ও নীচু আঘাতে গানের দ্বিগুণ ও চৌগুণ লয়ে তাকে অনুসরণ করে এই বাদ্যযন্ত্র।

বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে 'ভাওইয়া' সংগীত অঞ্চলে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। অরণ্য এলাকা কমেছে। নদীও অনেক মজে গেছে। রাজনৈতিক পালা বদলে বহু শরণার্থীরা এসেছে – বাস করছে। ফলে ভাষার মিশেল, ভাব ও মানসিকতারও দ্বন্দ্ব ঘটেছে। জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম – টিকে থাকার সংগ্রাম প্রবল হয়েছে। এসবের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশী সমাজ পুরোপুরি পাল্লা দিয়ে স্থির থাকতে পারেনি। ফলে সংস্কৃতি অবক্ষয় ঘটা স্বাভাবিক।

এই ভাওয়াইয়ায় 'মইশাল' বন্ধু বা মাহুত বন্ধুর গানে মৈষালের দু' চোখের স্বপ্ন, সুখচ্ছবি, এগুলিই মুখ্য, শুধুমাত্র বিনোদন এর মূলকথা ছিলনা। অরণ্যানীর মধ্যে এ গান এক দার্শনিক বাতাবরণ তৈরি করেছে মাঝে মাঝেই।

প্রাণবন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত গীত, সেই মৈষাল, সেই মাহুত হারিয়ে গেলেও প্রাণের স্পন্দন টুকু এখনও এ-বাংলার মাটির বুকে কান পাতলে আজও শোনা যায় –

'ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো কন্যা রে
মিছায় তোমার মায়া
ফুলের যৈবন শুকিয়া গেইলে
তোমরা যায় উড়িয়া –